শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই এখন ভারতীয় জনগণের অপরিহার্য কর্তব্য

বদরুদ্দীন উমর

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার সাথে শ্রেণী প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে বরাবরই সম্পর্কিত থেকেছে। কিন্তু এখন এটা যেভাবে স্পষ্ট হয়েছে এটা আগে কোন দিন দেখা যায় নি। বিগত লোকসভা নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণী শোষণ কিভাবে জনস্বার্থ, কৃষক শ্রমিকের স্বার্থের প্রশ্নকে ছাপিয়ে নিজের আধিপত্য রাজনীতি ক্ষেত্রে বিস্তার করছে। এই নির্বাচনে দেখা গেছে, সাম্প্রদায়িকতা ও তার নিকৃষ্টতম রূপ হিন্দুত্ববাদ কিভাবে জনস্বার্থকে পদদলিত করে নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করেছে। এরা জনগণকে তাদের নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বিজেপিকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এটা ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক মস্ত ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কিছু নয়।

২০১৪ সালের নির্বাচনে আম্বানি, টাটা ইত্যাদি থেকে বিশাল অঙ্কের হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে বিজেপি ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালানোর সময় ভারতের জনগণকে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কিছুই তারা রক্ষা করে নি। উপরন্তু তাদের শাসন আমলে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। কৃষকদেরকে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কোনটিই বাস্তবায়ন না হওয়ায় কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় দাঁড়িয়েছে। এ কারণে নির্বাচনের বেশ কিছু দিন আগে থেকেই তারা বড় আকারে সর্বত্র সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ কৃষক বিশাল বিশাল মিছিল করে দিল্লী, মুম্বাই সহ ভারতের প্রধান শহরগুলিতে দীর্ঘ মিছিল করে এসে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানিয়েছে। এই কৃষকদের প্রায় সমস্ত অংশই গরীব এবং দলিত বা নিম্ন বর্ণের হিন্দু। তাদের ওপর নির্যাতন কমিয়ে আনার পরিবর্তে বৃদ্ধিই কৃষকদের এই বিক্ষোভের মূল কারণ। কিন্তু শুধু কৃষকই নয়, শ্রমিক এবং বিভিন্ন পেশাজীবী মধ্যবিত্তের মধ্যেও এই বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ বড় আকারে দেখা গেছে।

কিন্তু এই সব বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কৃষকসহ শোষিত জনগণের বিশাল অংশ, অধিকাংশই, ভোট দিয়েছে বিজেপিকে। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অর্থ সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুত্ববাদকে ভোট দেওয়া। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুত্ববাদের শ্রেণী চরিত্র উপলব্ধি করতে তারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এটা ঘটেছে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও কৃষকসহ অন্যদের মধ্যে শ্রেণী চেতনার নিদারুণ অভাব, তাদের ওপর শোষণকে শ্রেণী শোষণ হিসেবে দেখার ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতার কারণে।

এর মূল কারণ শ্রেণী প্রশ্ন থেকে হিন্দুত্ববাদকে পৃথক করে দেখানোর চেষ্টা বিজেপির পক্ষ্য থেকে করা হলেও সেই সাথে ভারতের বামপন্থী দলগুলিসহ অন্যেরা হিন্দুত্ববাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সাথে শ্রেণী প্রশ্নের বিষয় সামনে আনা থেকে বিরত থেকেছে। কাজেই তাদের প্রচার প্রচারণার মধ্যেও কৃষক শ্রমিক জনগণের শ্রেণী স্বার্থ সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুত্ববাদ থেকে বিচ্ছিন্নই থেকে গেছে।

এই পরিস্থিতি ভারতের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে রীতিমত বিপজ্জনক। শুধু বিপজ্জনকই নয়, আতঙ্কজনক। কারণ ভারতে এখন সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে সেটা জনগণের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। জনগণ নিজেদের শ্রেণী স্বার্থকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে না শেখার কারণে তাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের রাজনীতি দীর্ঘদিন বর্ণ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এ কারণে কংগ্রেসও এ দুই বড় রাজ্য থেকে রাজনৈতিকভাবে প্রকৃতপক্ষে বহিস্কৃত হয়েছিল। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি এ দুই রাজ্যের নিম্নবর্ণের হিন্দু ও দলিতদের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর সাথে তারা উত্তর প্রদেশে যে বিজয় লাভ করেছিল তা বিস্ময়কর। কিন্তু বিজেপি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি। উপরন্তু গরীব কৃষক ও দলিতদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল। এ কারণে তারা উত্তর প্রদেশের বিধান সভার কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। তাদের ভোটের এই বিষয়টি বিবেচনা করে মনে করা হয়েছিল যে, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তারা বিজেপিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করবে। কিন্তু বাস্তবতঃ এর উল্টোটিই দেখা গেল। বিজেপি উত্তর প্রদেশে বিপুল বিজয় লাভ করলো! কৃষক ও দলিতরা নরেন্দ্র মোদির হিন্দুত্ববাদ ও সাম্প্রদায়িক প্রচারণার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে আবার বিজেপিকেই ভোট দিল। এর মূল কারণটি ভেবে দেখার বিষয়। কিন্তু লোকসভা নির্বাচন উত্তর যে সব বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে ভারতে দেখা গেছে তাতে এ বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব দেখা যায় নি। এক্ষেত্রে ভারতের বামপন্থী দলগুলি থেকে নিয়ে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির দেউলিয়াপনাই চোখে পড়ার মত।

কিন্তু শুধু রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, ভারতের লেখক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক সহ বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় ও প্রভাবশালী অংশ বিজেপির নির্যাতন, ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ, গণতন্ত্রের শ্বাস রোধ ইত্যাদি নিয়ে অনেক বক্তৃতা বিবৃতি লেখালেখি করেছেন। বিজেপির আমলে উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন সাংবাদিক, লেখক বুদ্ধিজীবী হত্যার বিরুদ্ধে তাঁরা জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির মত তাঁদের বক্তব্যের ক্ষেত্রেও শ্রেণী প্রশ্ন প্রায় বাইরেই থেকে গেছে। এর ফলে নরেন্দ্র মোদির হিন্দুত্ববাদের প্রকৃত রূপ জনগণের চোখের আড়ালেই থেকে গেছে। তাঁদের প্রতিবাদের কোন প্রভাব কৃষক শ্রমিকসহ দরিদ্র জনগণের কাছে পৌঁছায় নি। অথচ নির্বাচনে ভোট এই গরীব জনগণেরই। তাদেরকে বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কোন কাজেই আসে নি।

ভারতে শ্রেণী দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে কৃষক শ্রমিকের রাজনীতি আজ কোন্ পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে এটা লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যেই দেখা গেল। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম এর নেতৃত্বাধীন বাম ফ্রন্ট ৩৪ বছর একটানা ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে ৪০টি

আসনের মধ্যে তারা একটি আসনেও জয়লাভ করে নি। অর্থাৎ শ্রেণী রাজনীতির নাম পশ্চিমবঙ্গে এতদিন নামমাত্র হলেও যা অবশিষ্ট ছিল আজ আর তা নেই। প্রায় সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে। সারা ভারতেও তাদের অবস্থা একই রকম। মাত্র তিন চারটি আসনে তারা লোকসভার নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। এই পরিস্থিতি হঠাৎ করে, একদিনে তৈরী হয় নি। দীর্ঘদিন বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতি চর্চার যে পরিণতি স্বাভাবিক সেটাই পশ্চিমবঙ্গ, কেরালাসহ সারা ভারতে হয়েছে। এভাবে শ্রেণী রাজনীতির ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেই শূন্যতা পূরণ করেছে চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। ভারতে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও গণতান্ত্রিক মহলের শ্রেণী প্রশ্ন এখন প্রায় সম্পূর্ণ আড়ালে চলে গেছে যার প্রতিফলন ভারতের বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পীদের বক্তৃতা বিবৃতি ও প্রতিরোধের মধ্যেই ঘটেছে। তাঁরা তাঁদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জোরালোভাবে করলেও তাতে শ্রেণীর প্রশ্ন থাকে নি, এখনো নেই। এ কারণেই তাঁদের প্রতিবাদ প্রতিরোধ লোকসভা নির্বাচনে কোন প্রভাব বিস্তার করে নি। উপরন্তু বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী কৃষক শ্রমিকসহ গরীব জনগণের পক্ষে সম্ভব হয়েছে বিজেপির নির্যাতন এবং হিন্দুত্ববাদের পক্ষে ভোট দেওয়া। এছাড়া এই নিবাচনের ফলাফলের অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই।

মুসলিম লীগ ঘোষণা দিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রচার করেছিল এবং তার ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবী করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস ১৯৪০ এর দশক থেকে নিয়ে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে অঘোষিতভাবে সেই একই দ্বিজাতি তত্ত্বের ও নীতির চর্চা তাদের শাসন আমলে করে এসেছে। এ কারণে কংগ্রেসের শাসন আমলেই ভারতের মুসলমানরা পরিণত হয়েছে সে দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে। চাকরী ক্ষেত্রে তাদেরকে এমনভাবে বঞ্চিত রাখা হয়েছে যাতে দেশের জনসংখ্যার ১৫% এর ওপর মুসলমান হলেও তাদের কর্মসংস্থান ২% এরও কম। পশ্চিমবঙ্গে এদিক দিয়ে অবস্থা সব থেকে খারাপ। কংগ্রেস শাসনে এবং তার পর ৩৪ বছরের সিপিএম নেতৃত্বাধীন বাম ফ্রন্টের শাসনে সেখানে জনসংখ্যার ৩০% এর বেশী মুসলমান হলেও কর্ম সংস্থান ২% এর কম! এর থেকে যদি এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, মুসলমানদের প্রতি তাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচরণ কংগ্রেসের থেকে আলাদা কিছু ছিল না তাহলে কি ভুল বলা হবে? এর থেকে এই সিদ্ধান্ত যদি টানা যায় যে, মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের আমলের মতই বাস্তবতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে থেকেছে তাহলে এই বক্তব্যের কোন যুক্তিসংগত বিরোধিতা করা চলে? কাজেই নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি আকাশ থেকে পড়ে নি। তারা এখন সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দুত্বের ক্ষেত্রে যে নীতি কার্যকর করছে তার মধ্যে কি ভারতে বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতির ধারাবাহিকতাই রক্ষিত হচ্ছে না? এদিক দিয়ে বিজেপি কি কংগ্রেস, এমন কি সিপিএম এর মত কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির পরিণতি না?

১৯৪৮ সালে হঠাৎ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে বিপ্লবের ডাক দিয়ে এক ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল। বিপ্লবের কোন তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতিই তাদের ছিল না। এ কারণে মাত্র দুই বছরের মাথায় তাদের 'বিপ্লব' প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল এবং তারা দল হিসেবে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। এর পর পঞ্চাশের দশক থেকে তারা শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের চিন্তা শিকেয় তুলে সংসদীয় রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করেছিল। বিপ্লবের ক্ষেত্রে না হলেও সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কেরালা এবং পরে পশ্চিমবঙ্গে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা সরকার গঠন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে তারা ৩৪ বছর ধরে শাসন ক্ষমতায় ছিল। এভাবে শাসন ক্ষমতায় থেকে ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে অন্যান্য সংসদীয় দলের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে, নির্বাচনী রাজনীতির জন্য যা করা দরকার সেটা করতে গিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের নাম আর তারা নেয় নি। সংসদীয় দল হিসেবে আসলে তার মধ্যে যে সব সংকট দেখা দেয় সিপিএম এর মধ্যে সেই সব সংকট দেখা দিয়েছিল এবং তার পরিণামে ২০১১ সালে তারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা হারিয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে এখন তাদের রাজনৈতিক অবস্থান প্রায় নির্মূল হওয়ার মত।

সংসদীয় রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে থাকলে শ্রেণী সংগ্রাম চলে না। সকলকে দেশের সংসদীয় ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েই রাজনীতি করতে হয়। সিপিএম এবং সিপিআইকে তাই করতে হয়েছিল। এ কারণে তৃণমূলে কৃষক শ্রমিকের স্বার্থের সাথে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকে নি। অন্যদিকে যে কমিউনিস্টরা সংসদীয় রাজনীতির কাঠামোর বাইরে থেকে শ্রেণী সংগ্রামের চেষ্টা করেছিল বা এখনো করে যাচ্ছে তারা 'মাওবাদের' খপ্পরে পড়ে ব্যাপক কৃষক সমাজ ও শ্রমিকদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজ না করে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে ঝুঁকে ছিল। সংগ্রাম করতে গিয়ে তারা নিজেদের কাজের এলাকা বনজঙ্গলের কিছু আদিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। তারা মাঝে মাঝে ভারতের সেনা বাহিনী ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং পুলিশ ও সেনা সদস্যদের হত্যা করছে। কিন্তু তার দ্বারা ভারতের মতো শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কোন প্রকৃত ক্ষতিই হচ্ছে না। তারা অনায়াসে মাওবাদীদের সশস্ত্র বিপ্লবের মোকাবেলা বেশ সাফল্যের সাথেই করছে। নক্সালবাড়ী আন্দোলনের সময় কিছুটা ভিন্নভাবে এ চেষ্টা হলেও এ কারণে সে আন্দোলনও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

ভারতে প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রাম চালাতে হলে তার জন্য সমতল ভূমির ব্যাপক কৃষক জনগণ ও শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। কিন্তু এ ধরনের সংগঠন কৃষক শ্রমিকের মধ্যে কোথাও নেই। ব্রিটিশ আমলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে যে সামান্য বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিল তার তুলনায় এখন কিছুই নেই। এই পরিস্থিতি যে সামগ্রিকভাবে ভারতের রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতির কারণেই নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি জনগণকে যতই ধোকা দিক এবং তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন করুক তার বিরুদ্ধে কোন প্রকৃত প্রতিরোধ কোন ক্ষেত্রেই হচ্ছে না। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে বিজেপির নির্বাচন বিজয়ের এটাই মূল কারণ।

এই কারণের বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত ভারতের প্রগতিশীল ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী, লেখক, ঐতিহাসিক থেকে রাজনৈতিক মহল পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই হচ্ছে না। কিন্তু এই বিশ্লেষণই আজ ভারতের বিপ্লবীদের মূল কর্তব্য। এই বিশ্লেষণ না করে ভারতে নোতুনভাবে বিপ্লবী

শ্রেণী সংগ্রাম সংগঠিত করা সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে ভারতের বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আজ এক সংকটময় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণী সংগ্রাম নোতুনভাবে ও যথাযথভাবে সংগঠিত করা সংসদীয় রাজনীতি ও মাওবাদী লাইন থেকে সম্ভব নয়। আর শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়া ভারতের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম সংগঠিত করা ও সেই সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়ে ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এক সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতা এখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে বিজেপির নির্বাচন বিজয়ে। এর মোকাবেলা করা সম্ভব একমাত্র ভারতে শ্রেণী সংগ্রাম সংগঠিত করে। শ্রেণী সংগ্রাম সংগঠিত না করলে ভারতে চরম দক্ষিণপন্থী ও ফ্যাসিস্ট বিজেপি এবং আর.এস.এস. ঘরানার অন্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির প্রভাব নির্মূল করা ও তাদেরকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। বর্তমান পরিস্থিতি বজায় থাকলে পরবর্তি নির্বাচনেও বিজেপি হিন্দুত্ববাদের আওয়াজ তুলে কৃষক শ্রমিককে বিভ্রান্ত করে তাদের রাজনীতির জোয়ারেই আবার তাদেরকে ভাসিয়ে দেবে।

১১.৭.২০১৯

[*মাসিক সংস্কৃতি*, জুলাই ২০১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত]